Based on Schooling Islam
The Culture and Politics of Modern Muslim Education

স্কুলিং ইসলাম

বিশ্বব্যাপী বৈচিত্র্যময় মাদরাসাব্যবস্থা এবং
স্থানীয় সমাজ-সংস্কৃতি ও বিশ্বরাজনীতিতে তার প্রভাব

Based on Schooling Islam
The Culture and Politics of Modern Muslim Education

স্কুলিং ইসলাম

বিশ্বব্যাপী বৈচিত্র্যময় মাদরাসাব্যবস্থা এবং
স্থানীয় সমাজ-সংস্কৃতি ও বিশ্বরাজনীতিতে তার প্রভাব

সম্পাদনা

রবার্ট হেফনার ও
মুহাম্মাদ কাসিম জামান

ভাষান্তর
রাকিবুল হাসান

ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স

স্কুলিং ইসলাম
মূল : লেখকমণ্ডলী
অনুবাদ : রাকিবুল হাসান
সম্পাদনা : রবার্ট হেফনার, মুহাম্মাদ কাসিম জামান

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০২৩

স্বত্ব
প্রকাশক

আইএসবিএন : ৯৭৮-৯৮৪-৯৬৮৭৫-০-৯

প্রচ্ছদ
আবুল ফাতাহ মুন্না

প্রকাশক
ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স

অফিস : ৭/বি পি কে রায় রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
✆ ০১৭৬৮ ৮৬ ৪৪ ২৮
০১৭৮৯ ৮৫ ৪৬ ০২

মুদ্রণ
মার্জিন সলিউশন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com – wafilife.com

বানান ও পৃষ্ঠাসজ্জা : আবু আফিফ মাহমুদ

মুদ্রিত মূল্য
৫০০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

যুগসংস্কারক, শিক্ষাবিদ কাসিম নানুতুবি এবং শুন্য থেকে পৃথিবীর সফলতম সামাজিক শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তোলার অন্যান্য কারিগরদের...

সূচিক্রম

প্রথম অধ্যায়

স্কুলিং ইসলাম

ভূমিকা; ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কৃতি, রাজনীতি ও ভবিষ্যৎ..... ১৩
জ্ঞানই ইবাদাত..... ২৭
অর্থায়ন ও পরিচালনা..... ২০
মুসলিম ইউনিভার্সিটি? ২১
ইসলামের পুনকেন্দ্রায়ন ২২
আধুনিক মুসলিম 'বিনির্মাণ'..... ২৬
শিক্ষার উপনিবেশায়ন ৩১
অধ্যায় পরিচিতি..... ৩৬
উপসংহার ৪৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

মধ্যযুগ ও আধুনিকযুগে মাদরাসা; রাজনীতি, শিক্ষা এবং মুসলিম আত্মপরিচয়ের সংকট..... ৫৭

তৃতীয় অধ্যায়

দক্ষিণ এশিয়ার দেওবন্দি মাদরাসাসমূহের ঐতিহ্য ও কর্তৃত্ব..... ৭৯
মাদরাসাশিক্ষার ঐতিহ্য..... ৮২
ঐতিহ্যচর্চা ৮৪
রাষ্ট্র, মাদরাসা এবং ধর্ম-রাজনৈতিক কার্যক্রম..... ৮৯
মাদরাসা সংস্কার..... ৯৭
উপসংহার ১০১

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে মাদরাসা ও সংখ্যালঘু..... ১০৫
ইসলামচর্চা এবং ভারতীয় নাগরিকত্বের দাবি..... ১০৯
ভারতীয় মাদরাসা; স্তর, সাম্প্রদায়িক এবং সাংগঠনিক বৈসাদৃশ্য ১১১
মাদরাসা এবং শিক্ষাকেন্দ্রিক মূলধারা..... ১১৪
দিকনির্দেশনার প্রাণকেন্দ্র মাদরাসা; ফাতাওয়াপ্রদান ও সুফিসাধক..... ১১৮
উপসংহার ১২১

পঞ্চম অধ্যায়

ধর্মীয় শিক্ষা ও ডিসকোর্সের পুনঃকেন্দ্রীকরণ; বিশ শতকের মিশরে আল আযহার... ১২৫
মিশরে বর্তমান ধর্মীয় শিক্ষার হালচাল; বৈচিত্র্য ও ঝাঁঝরি ১২৭
আধুনিকায়িত ধর্মীয় শিক্ষা; সেক্যুলার ও ধর্মীয়মহলের ধারাবাহিকতা ১৩১
আল আযহারে উপনিবেশ-উত্তর রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রভাব; উলামাদের উত্থানপতন এবং পুনঃকেন্দ্রীকরণ ১৩৫
আল আযহারের পুনরুত্থান; রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক দৃশ্যপট ১৩৯
আন্তর্জাতিক বিতর্কে আল আযহারের পুনঃকেন্দ্রীকরণ; ফ্রান্সে হিজাব বিতর্ক..... ১৪০

ষষ্ঠ অধ্যায়

মরক্কান মাদরাসা; তিরোহিত গণ-অবদান..... ১৫১
প্রাক-উপনিবেশ ঐতিহ্যধারা ১৫২
মরক্কান মাদরাসা ও ইসলামি জ্ঞান : শিক্ষার্থীরা কেন কোরআন মুখস্থ করে?..... ১৫৪
অনুধাবনের সামাজিক রকমসকম (প্যারাডাইম)..... ১৫৬
মাদরাসায় ইসলামি উচ্চশিক্ষা ১৫৯
জ্ঞান ও সামাজিক পরিবর্তন..... ১৬১
স্বাধীনতা-উত্তর মরক্কোর মাদরাসাশিক্ষা ১৬২
মরক্কান মাদরাসা-ঐতিহ্য ১৬৩

সপ্তম অধ্যায়

সেক্যুলার তুর্কিতে ইসলাম ও শিক্ষা; রাষ্ট্রীয় নীতি এবং ফেতুল্লাহ গুলেন গ্রুপের উত্থান... ১৬৯
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট..... ১৬৯
দ্য টার্কিশ রিপাবলিক; ১৯২৩-১৯৪৬ ..... ১৭০
১৯৪৬ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত ইসলামের ক্রমবিবর্তিত ভূমিকা ১৭২
তুরস্কে ইসলাম; ১৯৮০ থেকে বর্তমান ১৭৩
বস্তুবাদী রাষ্ট্রের ইসলামি উপাদান ১৭৩
তুরস্কের শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলাম : ইমাম ও হাতিপদের জন্য ভোকেশনাল স্কুল ১৭৪
কোরআন কোর্স এবং বিশ্ববিদ্যালয় ১৭৫
স্কুলে ধর্মশিক্ষা..... ১৭৬
বিকল্প ধর্মশিক্ষা; ফেতুল্লাহ গুলেন..... ১৭৭
চক্র, চিন্তা ও কৌশল ১৭৮
তুরস্কের বাইরে শিক্ষাকার্যক্রম..... ১৮০
দ্য গুলেন ডিসকোর্স ১৮৩
আধুনিক যুগে ইসলাম রক্ষার সংগ্রাম..... ১৮৪
আধুনিকতার সাথে তুর্কি জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামের সমন্বয় ১৮৬
রাজনীতি ও ধর্মতত্ত্বের পূর্বে নৈতিকতা ও শিক্ষা ১৮৭
উপসংহার ১৮৯
নোটস..... ১৯৩

অষ্টম অধ্যায়

পেজান্ট্রেন এবং মাদরাসা; ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম স্কুল এবং জাতীয় মতাদর্শ ১৯৫
ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের ধরন ১৯৭
ভর্তিধারা ২০১
পেজান্ট্রেন এবং মাদরাসায় ভর্তিসংখ্যা ২০২
লিঙ্গ ও ইসলামি শিক্ষা ২০৩
শিক্ষার্থীদের দক্ষতা এবং স্কুলিং-এর ক্রমবিন্যাস ২০৪
ইসলামি শিক্ষাসংস্কার ২০৫
ইসলামি শিক্ষাসংস্কারে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা ২০৮
মুসলিম উচ্চশিক্ষার বৈপ্লবিক ভূমিকা ২১০
উপসংহার ২১৫

নবম অধ্যায়

মুসলিম স্কুলিং ইন মালি; মাদরাসাব্যবস্থার সামাজিক ও ধর্মীয় ভূমিকার ক্রমবিবর্তন ২২১
ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ২২২
কোরআনিক স্কুল ও মজলিস থেকে মাদরাসা ২২৫
প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন ২২৬
শিক্ষকতার পেশাবৃত্তি ২২৭
সংস্কারের অর্থনীতি ২২৮
পরিবর্তনের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ২২৯
শিক্ষাব্যবস্থার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব ২২৯
মাদরাসাশিক্ষার বিবর্তন ২৩১
র‍্যাশনালাইজেশন অব মুসলিম স্কুলিং ২৩৪
মুসলিম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ২৩৬
অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ২৩৮

দশম অধ্যায়

ব্রিটেনে ইসলামি শিক্ষা; প্লুরালিস্টিক সোসাইটিতে ধর্মীয় জ্ঞানচর্চার ধারা ২৪৫
ব্রিটেনে ইসলাম; একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ২৪৭
ব্রিটেনে ইসলামি শিক্ষার বৈচিত্র্য ২৪৯
ইসলামি শিক্ষা পরিচিতি : মুসলিম ফেইথ স্কুল ২৫১
উচ্চশিক্ষা ও ধর্মীয় পেশাবৃত্তি প্রশিক্ষণ ২৫৩
দ্য মুসলিম কলেজ ২৫৪
দ্য মার্কফিল্ড ইন্সটিটিউট অব হায়ার ইডুকেশন ২৫৫
মাদরাসা/দারুল উলুম ২৫৮
বহুমাত্রিক সমাজে ইসলামি শিক্ষার চিত্রায়ণ ২৫৯
দায়স্বীকার ২৬০

একাদশ অধ্যায়

পরিশেষ; ধর্মীয় শিক্ষার বিপরীতমুখী ধারণাসমূহ..... ২৬৩
শিয়া মাদরাসাসমূহে সংস্কার বিতর্ক ২৬৩
সৌদি আরবের ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ২৭৪

লেখক ও সম্পাদকবৃন্দ

প্রকাশকের কথা

কাকতালীয়ভাবেই বলা যায়, ২০২৩-এর নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে যখন বিতর্ক তুঙ্গে, তখন শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে এই অসাধারণ গবেষণাগ্রন্থটি আমরা প্রকাশ করতে যাচ্ছি। অবশ্যই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি চলমান বিতর্কের রাশ টেনে ধরবে বা তাতে সহায়তা করবে, এমন দাবি আমাদের নয়। তবে এতটুকু দাবি করতে দ্বিধা নেই যে, শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে যারা সামান্য হলেও ভাবেন, এর সামাজিক সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক প্রভাবকে অল্প হলেও অনুধাবন করেন, তাদের চিন্তার অচলায়তনে একটা তীব্র ঝাঁপুনি তুলবে এই বই।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার যে বিপরীতমুখী দুটি ধারা—ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষা—দুই ধারায় বইটি দুই ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে বলে আমার ধারণা। গবেষণা গ্রন্থটি প্রণয়ন করা হয়েছে যেহেতু তালেবানের কাবুল দখল, নাইন ইলেভেন এবং এ জাতীয় কিছু ঘটনার পর পশ্চিমাবিশ্বে মুসলিমদের মাদরাসাব্যবস্থা নিয়ে হইচই পড়ে যাবার প্রেক্ষাপটে, ফলে প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাদরাসা বা ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার উত্থান, ঐতিহাসিক পরম্পরা, সামাজিক প্রভাব ও এর সমকালীন বিচিত্র রূপ সম্পর্কে যাদের জানাশোনার কমতি আছে, তাদের জন্য এর গুরুত্ব একরকম। অপরদিকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যারা মাদরাসাব্যবস্থার সাথে নানাভাবে জড়িত, মাদরাসা সমাজ ও রাষ্ট্রের ত্রিমুখী টানাপোড়েনে দীর্ঘদিন ধরে যাদের দম ফুরোনোর দশা—তাদের জন্য এই কাজটির মূল্য এককথায় বলে বোঝাবার মতো নয়। এই শ্রেণির একজন হবার সুবাদে আমি নিজেই এটি উপলব্ধি করতে পেরেছি।

তাই আমি আশাবাদ ব্যক্তিত্ব করছি যে, বইটি উভয় শ্রেণির পাঠকের কাছে সমাদৃত হবে এবং তাদের আলোচনার টেবিলে জায়গা করে নেবে। বইটি নিয়ে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় জগলুল আসাদ স্যার, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা। অনুবাদে রাকিবুল হাসান বরাবরের মতোই তার মুন্সিয়ানার ছাপ রেখেছেন এবং অতীব প্রয়োজনীয় কিছু জায়গায় টীকা যোগ করেছেন।

পরিশেষে বলতে চাই, বইটি যদি পাঠকের চিন্তায় কিছুটা হলেও পরিবর্তন আনে; তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি। বইটিকে আলোর মুখ দেখাতে এ পর্যন্ত যারা এর সাথে ছিলেন, তাদের সবার প্রতি শুকরিয়া এবং বিশেষকরে প্রিয় পাঠক, আপনার জন্য অগ্রিম শুভকামনা।

প্রকাশনার পক্ষে
আবদুর রহমান আদ-দাখিল
সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম
০৬/০২/২৩

আমার কথা

বইটি ভাষান্তর শুরু করার পর প্রথম দিকে প্রচুর টীকা সংযুক্ত করেছিলাম। মাঝামাঝি যাওয়ার পর ক্ল্যারিফিকেশন বাদে বাকিগুলো কেটে দিয়েছি। আমার মনে হয়েছে বইটি বহুমুখী চিন্তার স্রোতঃস্বিনী মোহনা। নানা রং, নানা ঢং, নানা উৎসের বারি এখানে এসে মিশেছে। আমি চাই পাঠক সেই জলে অবগাহন করুক। সেই জ্ঞানের মুক্তো আহরণ করুক। লেখকরা যা বলতে চেয়েছেন, তা; যেভাবে বলতে চেয়েছেন, সেভাবেই।

বইয়ে বাংলাদেশের মাদরাসাশিক্ষা নিয়ে একটি প্রবন্ধ সংযুক্ত করার ইচ্ছা ছিল। সময় স্বল্পতার কারণে করা যায়নি। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে বাংলাদেশের মাদরাসাশিক্ষার সংস্কৃতি, রাজনীতি, ইতিহাস ও অবদান যুক্ত হবে। অনুবাদক হিসেবে ভূমিকায় যা বলা প্রয়োজন মনে করছি, তার সব; বরং এর চেয়ে বহুগুণ বেশি মূল বইয়েই রয়েছে। সুতরাং পাঠকের ধৈর্যের পরীক্ষা না নিই।

বাংলাদেশের শিক্ষাখাত ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। বিশেষত ধর্মীয় শিক্ষা। সংকটের এই কালে বইটি আশা করি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে উদ্‌বিগ্ন-চিন্তাশীলদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।

মাআস সালাম

রাকিবুল হাসান
তাকমিল; মাদরাসা বাইতুল উলুম, ঢালকানগর
ইফতা; জামিয়াতুল মাআরিফ আল ইসলামিয়া, যাত্রাবাড়ি
শিক্ষার্থী; আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
rakibulhasanduir@gmail.com

প্রথম অধ্যায়

স্কুলিং ইসলাম

ভূমিকা; ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কৃতি, রাজনীতি ও ভবিষ্যৎ

✍ রবার্ট ডব্লু হেফনার

১৯৯৬ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর। আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল তালেবানরা দখল করে নিল। সাথে সাথেই পশ্চিমা মিডিয়া তথাকথিত ইসলামি চরমপন্থা ও ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যকার সংযোগ উদ্‌ঘাটনে আদাজল খেয়ে নেমে গেল। অনেক ভাষ্যকার খুব দ্রুততার সাথে চরমপন্থার দায়টা মাদরাসার ঘাড়ে দিয়ে দিলেন। *নিউইউর্ক টাইমস* ম্যাগাজিনে প্রকাশিত বহুল আলোচিত এক আর্টিক্যালে দাবি করা হয়, 'পাকিস্তানে দশ হাজারের অধিক মাদরাসায় অন্তত এক মিলিয়ন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। সশস্ত্র ইসলামই এসব মাদরাসার প্রাণভোমরা' (Goldberg 2000)।[১] অন্য ভাষ্যকারদের মতে শুধু পাকিস্তান নয়, সর্বত্রই মাদরাসা শিক্ষার প্রাণ হচ্ছে সামরিক উদ্দীপনা। কিছু মুসলিম দেশ ও সমাজে সাম্প্রতিক দাঙ্গাহাঙ্গামা ও অস্থিরতার ফলে কতিপয় পশ্চিমা ভাষ্যকার ইসলামি শিক্ষার কেন্দ্রীয় এই প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে অভিযোগের আঙুল তুলছে—এতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছুই নেই।

তালেবান নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই পড়াশোনা করেছেন আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্তবর্তী শরণার্থী ক্যাম্পগুলোর আশেপাশে অবস্থিত মাদরাসায়। আশির দশকে এখানে মাদরাসার সংখ্যা এবং প্রভাব—দুটোই উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। প্রবৃদ্ধির বেশকিছু কারণ ছিল; আফগান শরণার্থীদের ক্রমবর্ধমান স্রোত, দরিদ্র পাকিস্তানিদের 'শিক্ষা ক্রয়ের' অক্ষমতা এবং পাকিস্তান-সৌদি-গালফ দেশগুলোর অনুদান। স্মর্তব্য, তখন এগুলো হয়েছিল আমেরিকার সরকারি (অফিশিয়াল) ইচ্ছা ও অনুমোদনক্রমে, সোভিয়েতবিরোধী শক্তিকে সমর্থন জোগানোর লক্ষ্যে (ICG 2002; Zaman 2002, 136)।

জটিল এই প্রতিবেশে পাকিস্তানের কিছু মাদরাসা অবশ্যই জিহাদি আন্দোলনের ট্রেনিং সেন্টার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ—সোভিয়েত ইউনিয়নের

---

[১] নোট : যদিও তালেবানের উত্থান ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থাকে পশ্চিমা মিডিয়ার প্রাণকেন্দ্রে নিয়ে এসেছে, কিন্তু উনিশ শতকের শেষপ্রান্ত থেকেই মাদরাসাব্যবস্থার প্রতি স্কলারদের আগ্রহের সূচনা হয়। পরবর্তীকালে ইরান বিপ্লবের প্রাক্কালে সেই ঢেউ নতুন মাত্রা পায়। ইংরেজিভাষী স্কলাররা এসময় অনেক কাজ করেছেন। সেই তালিকায় রয়েছে ডেল এফ ইক্যালম্যান (১৯৮৫), মাইকেল এম জে ফিস্কার (১৯৮০), ডেভিড মেনাশরি (১৯৯২) এবং রয় মুত্তাহেদার (২০০০) যুগান্তকারী গবেষণাকর্মসমূহ। আল আজহার সম্পর্কে নিকোল গার্ডিয়ান এবং মার্ক গ্যাবোরির (১৯৯৭) সংগ্রহ, মালিকা জেঘালের (১৯৯৬) গবেষণা ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে ফরাসি পণ্ডিতদের গভীরতা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিরুদ্ধে মুজাহিদিনদের যুদ্ধজয়ের পূর্বেই কিছু জিহাদির শত্রুর তালিকায় সোভিয়েত ইউনিয়েনের সাথে আরও অন্যান্য শত্রুও ঢুকে পড়ে। যেমন পাকিস্তানে সুন্নি সশস্ত্র গ্রুপগুলো শিয়াদের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে (see Zaman 2002, and this volume)। ভারতের দখলকৃত কাশ্মীর প্রদেশ কারও নিশানায় পরিণত হয়, তারা সেখানে আক্রমণ চালাতে শুরু করে। বাকিদের শত্রুর খাতায় মুসলিমবিশ্বের প্রতি গৃহীত পররাষ্ট্রনীতির কারণে যুক্তরাষ্ট্রের নাম চলে আসে।

ইন্দোনেশিয়ার ঘটনাবলিও মাদরাসা শিক্ষা সম্পর্কে অনুরূপ উদ্‌বেগ তৈরি করে। ১৯৯৮ সালের মে মাসে প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর স্বৈরাচারী সরকারের পদত্যাগের পর দেশজুড়ে শহর-নগরে শত শত ইসলামি প্যারামিলিটারি গ্রুপের আবির্ভাব ঘটে। যাদের অনেকেই মাদরাসা শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ২০০২ সালে বালি বোম্বিং-এর পর—যাতে ২০২ জন নিহত হয়েছিল, বেশিরভাগই ছিল পশ্চিমা পর্যটক—দেশের ৪৭ হাজার মাদরাসার মধ্যে গুটিকতেক ইসলামিক স্কুলের সাথে আক্রমণ পরিচালনাকারী মিলিট্যান্টদের সম্পৃক্ততা পাওয়া গিয়েছিল।

এগুলো এবং এই ধরনের আরও কিছু উদাহরণ থেকে বহু 'গবেষক' এই উপসংহারে পৌঁছে যান যে, মাদরাসাগুলো জিহাদি ফ্যাক্টরি! পশ্চাৎমুখী মধ্যযুগপন্থীদের আখড়া (see e.g. Haqqani 2002)।

এই অস্থির প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে বক্ষ্যমাণ বইয়ের রচয়িতাগণ মাদরাসা ও ইসলামি উচ্চশিক্ষার ধরন-ধারণ, সংস্কৃতি, প্র্যাক্টিস ও পলিটিক্সের ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। বইয়ের লেখকগণ মাদরাসা শিক্ষার ওপর গঠিত একটি ওয়ার্কিং গ্রুপে দশ মাসব্যাপী কাজ করেছেন। যা 'পিউ চ্যারিটাবল ট্রাস্ট' এবং বোস্টন ইউনিভার্সিটির 'দ্য ইন্সটিটিউট অন কালচার, রিলিজিয়ন অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড এফেয়ার্স' এর অর্থায়নে পরিচালিত হয়েছে। অক্টোবর ২০০৪ থেকে মে ২০০৫ পর্যন্ত ইসলামি শিক্ষার অতীত, বর্তমান ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ নিরীক্ষণের চেষ্টা চালিয়েছেন। মুসলিম দেশের সাধারণ কিংবা সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের বিষয় ছিল না, আমাদের দৃষ্টি ছিল ইসলামি শিক্ষাবিস্তারে নিরত প্রতিষ্ঠান ও সাবজেক্টগুলোর ওপর।

আমরা এখানে তাত্ত্বিক ও পর্যালোচনামূলক (থিওরিটিক্যাল অ্যান্ড কম্পারাটিভ) ধারা অনুসরণ করেছি। আমাদের মূল এজাম্পশান হচ্ছে—ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা একটি পুরোপুরি সামাজিক বিষয়। যেখানে জ্ঞান, রাজনীতি ও সামাজিক জালের (নেটওয়ার্কের) মিথস্ক্রিয়া ঘটে খুবই জটিল ও প্রোডাক্টিভ এক পদ্ধতিতে (Barth 1993, 5, 341)। ইন্টারডিসিপ্লিনারি ওয়েতে (বহু বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে) ওয়ার্কিং গ্রুপটা তৈরি করা হয়েছে। যেখানে রয়েছে ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব এবং ধর্মীয় শিক্ষা-বিষয়ক স্কলাররা।

যদিও বইয়ের প্রতিজন লেখকের বক্তব্য ভিন্ন ভিন্ন গল্প শুনাচ্ছে, কিন্তু মোটাদাগে তারা দুটি দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করেন। এক, ইসলামি শিক্ষা তালাবদ্ধ একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা নয়। এখানে বৈচিত্র্য আছে। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও ধারণায় বহুমাত্রিকতা রয়েছে। বর্তমানে বহু

দেশে ইসলামি শিক্ষা পরিচালিত হয় সরকার ও সরকারসংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর মাধ্যমে। যাদের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম নিয়ে বহু বিতর্ক রয়েছে। বিতর্কের কেন্দ্রে আছে দুটি প্রশ্ন; আধুনিক বিশ্বে একজন নিবেদিতপ্রাণ মুসলিম হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে কী কী করণীয়? এবং এই বিষয়ে দিকনির্দেশনার যোগ্যতা ও ক্ষমতা কার? এসব বিতর্কে বিভিন্ন দল প্রকাশ্যে এই আলাপ তোলে যে তারা কারা, তাদের প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব কী। এই বিতর্কে যে জিনিসটা খুব তীব্রভাবে প্রতীয়মান হয়—মাদরাসা আর যা-ই হোক, মধ্যযুগীয় অপরিবর্তনশীল কোনো প্রতিষ্ঠান নয়; বরং মাদরাসাগুলোকে প্রতিনিয়ত চতুর্মুখী আত্মপরিচয়কেন্দ্রিক এবং সাংস্কৃতিক প্রশ্নের মোকাবিলা করতে হয়, যা মূলত আধুনিক বহুমাত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য।

যদি বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের জায়গা করে নেওয়ার কোনো সংগ্রাম চলমান থেকে থাকে—নিঃসন্দেহে আছে—মাদরাসা আর ধর্মীয় শিক্ষা এই সংগ্রামের ফ্রন্টলাইন।

আমাদের এই প্রথম পয়েন্ট, দ্বিতীয় পয়েন্টের দিকে নিয়ে যায়। ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্যরা মনে করে বর্তমান রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে প্রচলিত বাগাড়ম্বর আর ক্ষোভ-ক্রোধকে গবেষণায় স্থান না দেওয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেন বিশ্বদরবারে জায়গা করে নেওয়ার ক্ষেত্রে মুসলিমদের সুপ্রাচীন সংগ্রামটি—যা ১৯৯০ এর দশকে পশ্চিমা মিডিয়া মাদরাসা জগৎকে আবিষ্কারের বহু পূর্ব থেকে চলমান—অস্পষ্ট হয়ে না যায়। তুরস্ক, মিশর, ইরান, ইন্ডিয়াতে বর্তমান ইসলামি শিক্ষার জন্ম অন্তত দুই শতাব্দী পূর্বে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়া এবং পশ্চিম আফ্রিকাতে এক শতাব্দী ধরে এই প্রশ্ন জাগরুক।

অধিকন্তু, ইজরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাত, কিংবা ইরাকে আমেরিকার আগ্রাসন এই বিতর্কের কেন্দ্রীয় ইস্যু নয়। বরং সেই গতানুগতিক প্রশ্ন—ইসলামি স্কুলগুলোতে বিজ্ঞান পড়ানো হবে কিনা, থিওলজির পাশাপাশি ফিলোসফি শিখবে কিনা, আধুনিক রাজনীতি আর নাগরিকতার (Citizenship) ওপর আলোকপাত করবে কিনা। বিতর্করত পক্ষগুলোর মতানৈক্য সত্ত্বেও একটি বিষয়ে মতৈক্য রয়েছে; তাদের আলোচিত বিষয়গুলো মুসলিম মধ্যযুগের—(১০০০-১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ) যে সময় প্রথম মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—আলোচিত বিষয়াবলি থেকে ভিন্নতর। ইসলামিক শিক্ষার শিকড় যেখানেই প্রোথিত হোক না কেন, বর্তমান মাদরাসাগুলো আধুনিক বিশ্বের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে চারটি মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে মাদরাসাগুলোর আধুনিকায়নের (Modernization of Madrasa) তত্ত্ব তালাশে ব্যাপৃত হব।

সেগুলো হচ্ছে—মাদরাসা ও অন্যান্য ইসলামি প্রতিষ্ঠানের বৈচিত্র্য সন্ধান, আধুনিক সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির চাপে মাদরাসা ও ইসলামি উচ্চশিক্ষার ক্রমবিবর্তন, রাষ্ট্রের মাদরাসা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের বাসনা, বিশ্বায়ন ও বহুমাত্রায়নের (Pluralization) যুগে মাদরাসা শিক্ষার ভবিষ্যৎ।

শেষ পয়েন্ট থেকেই বুঝা যাচ্ছে আমাদের লেখকদের সবাই একটি বিষয়ে বেশ মনোযোগ দিয়েছেন—'মুসলিম কর্তৃপক্ষ' কীভাবে আমাদের সময়ের স্বতন্ত্র বহুমাত্রিকতার

মোকাবিলা করছে। পূর্বেকার সমাজগুলোর চেয়ে আমাদের সময়ের সামাজিক বহুমাত্রিকতা বা বহুত্ববাদের রূপ ভিন্ন। ফার্নিভালের মতে বহুত্ববাদ বা প্লুরালিজম হচ্ছে 'দুই বা ততোধিক উপাদান কিংবা সামাজিক শ্রেণি পরস্পর সংমিশ্রণ ছাড়াই পাশাপাশি বসবাস করবে, একটি রাজনৈতিক ইউনিট হিসেবে' (Furnivall 1944, 446)।

আমাদের সময়ের বহুমাত্রিকতা ফার্নিভালের উল্লিখিত কলোনিয়াল 'পৃথকীকরণ বহুমাত্রিকতা' (Segregationist Pluralism) নয়। মানুষ, বস্তু ও ধারণা; এই তিনটির তীব্র মাত্রার পারস্পরিক মিশ্রণ বর্তমান সময়ের প্রধান চরিত্র। বাজার, মিডিয়া ও সামাজিক আন্দোলনগুলো এখন জাতি ও রাষ্ট্রের সীমানাকেও ছাপিয়ে গেছে এবং যায়। ফলে 'সমাজ' পুরোপুরি একক 'সংস্কৃতিধারী', এবং উভয়টিই সুনির্দিষ্ট (ভৌগোলিক) 'সীমানায়' আবদ্ধ—সমাজের এই সংজ্ঞা এখন অচল (Barth 1993; Hannerz 1992, 262; Hefner 2001)। যদিও সমাজতাত্ত্বিকরা একসময় এই সংজ্ঞা প্রদান করতেন। সমাজ থেকে সমাজান্তরে মানুষ ও মতাদর্শের অপ্রতিহত স্রোত আইডেন্টিটি (আত্মপরিচয়) বিচূর্ণ করে দিয়েছে, সামাজিক স্তরবিন্যাস অস্থিতিশীল করে ফেলেছে এবং চিরায়ত সমস্ত বিশ্বাস ও জ্ঞানকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে।

আমাদের এই ভূমিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে আধুনিকতা-উত্তর পরিবর্তনগুলো ইসলামি জ্ঞানের স্বরূপ, সঞ্চালন ও অর্থকে কীভাবে প্রভাবিত করছে, তা খতিয়ে দেখা। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে শুরুতে আমাদের জানতে হবে ঠিক কোন সামাজিক প্রতিবেশে ইসলামি শিক্ষার প্রাথমিক উন্মেষ ঘটেছিল। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানা থাকলে আমরা ইসলামি শিক্ষায় পরিবর্তনের মাত্রা অনুভব করতে পারব এবং জনপরিসরে এগুলোর সামাজিক ও ও রাজনৈতিক প্রয়োগ অনুধাবন করতে পারব।

ইসলামি শিক্ষার বিস্তার সবসময়ই তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল ছিল। সুনির্দিষ্ট সমাজকাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত থাকার ফলে সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে ধর্মীয় শিক্ষার ধারাও বিবর্তিত হয়েছে। তবে প্রতিটা সামাজিক পরিবর্তনের সাথেই ইসলামি শিক্ষাবিস্তারে নিরত প্রতিষ্ঠানগুলো আমূল বদলে যায়নি।

মুসলিম স্কলার তথা উলামারা যে শিক্ষাধারায় অভ্যস্ত ছিলেন, তার অনেক দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল ঐশ্বরিক। পরিবর্তন অযোগ্য। ফলে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তৎকালীন প্রেক্ষাপটকে ইসলামের অবিনশ্বর সত্যের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হতো। নৈতিক রক্ষণশীলতার (Normative Conservational Preservation) সংরক্ষণের প্রতিও লক্ষ রাখতে হতো (Eickelman 1985, 58)। সংরক্ষণবাদ আর সাম্প্রতিকতা বা সমকালীনতার এই অসাধারণ সম্মিলন সবসময় সহজ ছিল না। কোন শিক্ষা সর্বাগ্রে, সামাজিক কোন উদ্দেশ্যে তা নিবেদিত—এ নিয়ে ধর্মীয় স্কলারদের মাঝে মতানৈক্য ছিল। সাথে ছিল ইসলামি শিক্ষার স্বরূপ ও উদ্দেশ্য নিয়ে শাসক আর ওজিরদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি।

যদিও মুসলিম ইতিহাসের পুরোটা সময়জুড়েই এই জাতীয় প্রশ্নের মোকাবিলা করতে হয়েছে। কিন্তু আধুনিক সময়ে এসে তা শুধু নিরবচ্ছিন্নই হয়নি, স্থায়ী হয়ে গেছে। বিগত দুই শতকে শক্তিশালী হস্তক্ষেপপ্রবণ (Interventionist state বা এমন রাষ্ট্র যা নাগরিকের জীবনধারা নির্ধারণ করে দেয়) রাষ্ট্রের উত্থান ঘটেছে, এসব রাষ্ট্রের শিক্ষাবিষয়ক উচ্চাশা উলামাদের চিন্তার চেয়ে ভিন্নতর। একই সময়ে মুসলিম-সমাজের ভেতরে এবং বাইরে বহুত্ববাদ তীব্রতর হয়েছে। আমাদের সময়ের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পশ্চিমের অপ্রতিহত উত্থান—তাদের বাজার, মিডিয়া, টেকনোলজি আর জ্ঞান; সবকিছু-সহই তাদের উত্থান। ইসলামি শিক্ষাবিস্তারে যারা নিরত, তারাও বিশ্বকে পালটে দেওয়া এসব পরিবর্তনের প্রভাব হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছেন।

যেসব বিষয়ের সূচনা মুসলিম স্কলারদের হাত ধরে ঘটেনি, কিন্তু সেগুলোকে উপেক্ষাও করা যাচ্ছে না—এমনসব বিষয়ের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সংগ্রামের ভেতর দিয়ে উনিশ ও বিশ শতক অতিবাহিত হয়েছে। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে তারা যে সম্ভাব্য সমাধান পেশ করেছেন, তা ইসলামি শিক্ষা ও সমাজের খোলনলচে পালটে দিয়েছে। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটই ইসলামি শিক্ষার গুরুত্ব বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ইসলামি স্কুলগুলো নিছক ইসলামি শিক্ষাবিস্তার আর তরুণ বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষণে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এগুলো পরিণত হয়েছে সেই কামারশালায়, যেখানে প্রস্তুত হবে ভবিষ্যৎ মুসলিমবিশ্বের দিশারি চিন্তা ও নেতা। এই বই—সেসব বহুমুখী বোধ ও প্রভাব নিরূপণে সচেষ্ট।

জ্ঞানই ইবাদাত

ইতিহাসের পুরোটা সময়জুড়ে ধর্মীয় জ্ঞানের (ইলম) অধ্যয়ন ও প্রচার ছিল ইসলামি ঐতিহ্যের প্রাণবিন্দু। ইসলাম বইয়ের (কোরআনের) ধর্ম, ধর্মীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ধর্ম। ধর্মীয় জ্ঞানচর্চা মুসলিমদের নিকট ইবাদাত হিসেবে বিবেচ্য। মৌলিকভাবে প্রতিটি মুসলিম কোরআন, হাদিস, ফিকহ ও শরিয়া অধ্যয়ন এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জনে আদিষ্ট।

সুপ্রাচীনকাল থেকে জ্ঞানচর্চার 'গুরু-শিষ্য' ধারা নেতৃত্বের একটি জাল তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে, যা মুসলিম-সমাজে পশ্চিমে খ্রিষ্টধর্মের মতো প্রতিষ্ঠিত পোপতন্ত্র আর চার্চতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে ধর্মীয় নেতৃত্ব প্রদান করেছে। এরিস্টটলের মতো মুসলিম কর্তৃপক্ষও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক তৈরি ও 'সার্বজনীন কল্যাণ' (Common Good) নিশ্চিতে নৈতিক শিক্ষাকে অপরিহার্য মনে করতেন (Arjomand 1999, 266; cf. Mahmood 2005, 136)। এসব কারণে মুসলিম সভ্যতার প্রাণবিন্দু ছিল ধর্মীয় শিক্ষাবিস্তার। এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের অপরিহার্য দায়িত্ব ছিল শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা প্রদান।

যদিও ইসলামি সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ছিল জ্ঞান-বিস্তার, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে জ্ঞানদাত্রী প্রতিষ্ঠান ও এগুলোর আদলে পরিবর্তন এসেছে। মুসলিম মধ্যযুগ, ১০০০ থেকে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই কাজের প্রধান প্রতিষ্ঠান ছিল মাদরাসা, যা ইসলামি বিজ্ঞানচর্চা করত। বর্তমানে আরবিভাষী মধ্যপ্রাচ্যে মাদরাসা বলতে সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয়

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—উভয়ই বুঝানো হয়। তবে প্রাচীন সময়ে এবং এখনো অ-আরব মুসলিমবিশ্বে মাদরাসা বলতে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চায় নিরত প্রতিষ্ঠানসমূহকেই বুঝানো হয়ে থাকে।

মাদরাসায় যেসব ইসলামি বিষয় পড়ানো হয় তন্মধ্যে রয়েছে—কোরআনের বিশুদ্ধপঠন (কিরাআহ), আরবি ব্যাকরণ বা নাহু-সরফ, কোরআনুল কারিমের ব্যাখ্যা বা তাফসির, আইনশাস্ত্র বা ফিকহ, আইনের উৎস বা উসুলুল ফিকহ, তর্কশাস্ত্র বা ইলমুল কালাম ইত্যাদি। কিছু ক্ষেত্রে মধ্যযুগের মাদরাসাগুলো অ-ধর্মীয় বিষয়াবলিও শিক্ষা দিত। যেমন গণিত, জোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শন ও কাব্যশাস্ত্র (Bulliet 1994)। মাদরাসাগুলো মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিস্তারে নিরত ছিল, এগুলো ছিল প্রাথমিক ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী প্রতিষ্ঠানগুলোর চেয়ে আলাদা। যেগুলোতে শুধু কোরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দেওয়া হতো। যদিও এগুলোর নাম ও সামাজিক গঠন ভিন্ন ভিন্ন ছিল, কিন্তু আরববিশ্বে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে নিরত প্রতিষ্ঠানগুলো 'কুত্তাব' নামে পরিচিত ছিল। কুত্তাবগুলোতে তরুণদেরকে কোরআন তিলাওয়াত শেখানো ও মুখস্থ করানো হতো, যা ছিল তাদের পাণ্ডিত্যের প্রথম ধাপ (Eickelman 1985, 50, and this volume)।

ঐতিহাসিক প্রমাণাদি এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে উমর (৬৩৪-৪৪) ও উসমান (৬৪৪-৫৬) এর তত্ত্বাবধানে স্কলাররা কোরআনুল কারিম সংকলন সমাপ্ত করার অব্যবহিত পরপরই কুত্তাবের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে ওঠে, ইসলামের প্রথম শতাব্দীতেই (Bulliet 1994, 28)। যার তিন শতাব্দী পর মাদরাসার উত্থান হয়। খ্রিষ্টীয় দশম শতকে প্রথম মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে সেটি আরবে ছিল না, ছিল পূর্ব ইরানের খোরাসান অঞ্চলে। এখান থেকে এটি ছড়িয়ে পড়ে। বাগদাদে ১০৬৩ সালে, দামেশকে ১০৯০ সালে, কায়রোতে ১১৭০ সালে এবং স্পেন ও ভারতে ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দশকে (Bulliet 1994, 148–9)। এগারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিখ্যাত সেলজুক উজির নিজামুল মুলক ইরাক ও সিরিয়াজুড়ে এগারোটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন (Arjomand 1999, 269–70)। বারো শতক নাগাদ মাদরাসাব্যবস্থা 'মধ্যযুগীয় নিকট প্রাচ্যের'[২] শহুরে প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে ব্যতিক্রমী ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয় (Berkey 2003, 187; this volume)। এই প্রতিষ্ঠান মুসলিম-সমাজের বহু নক্ষত্ররাজির প্রশিক্ষণকেন্দ্র। যাদের ভেতর রয়েছে বিচারক, ধর্মীয় স্কলার, গণিতবিদ, ডাক্তার এবং জ্যোতির্বিদ। সব বিচারেই, মধ্যযুগে মাদরাসা ছিল মুসলিম সিভিল সোসাইটির কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান (Arjomand 1999; Hoexter 2002)।

মাদরাসার ঐতিহাসিক উত্থানের পূর্বেও ধর্মবিজ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষা প্রচলিত ছিল, কিন্তু সেটা সুনির্দিষ্ট কাঠামো এবং মানদণ্ডের সেই পরিমাণ অনুসরণ করত না যতটা করেছে মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর। পূর্বেকার উচ্চশিক্ষা ছিল অপ্রাতিষ্ঠানিক হালাকা বা আসরভিত্তিক। কোনো শাইখের তত্ত্বাবধানে মসজিদ, বাড়ি কিংবা দোকানে পরিচালিত

[২] এটি একটি ভৌগোলিক পরিভাষা যা মিশর, সিনাই উপত্যকা, তুর্কিস্তান, আনাতোলিয়া আর উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।

হতো। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে মাযহাবের উত্থানের সাথে সাথে ইসলামি জ্ঞানের জটিলতা ও সূক্ষ্মতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। যার ফলে উচ্চশিক্ষার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হতে শুরু করে (Berkey 1992, 7; Makdisi 1981)। এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে উচ্চশিক্ষা প্রদানকারী মসজিদগুলোতে আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ শুরু হয়।

দশম শতাব্দীর মাদরাসাগুলো এই প্রক্রিয়াকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। আলাদা ক্লাসরুম, ডরমিটরি এবং ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা হয়। তবে এ সময়ের সব ব্যবস্থাপনা ছিল পুরুষদের জন্য।[৩]

ধীরে ধীরে মাদরাসাগুলোতে নসিহতগাহ (খানকাহ), প্রতিষ্ঠাতার আবাসরুম, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আবাসন ব্যবস্থা এবং মসজিদ অন্তর্ভুক্ত হতে শুরু করে। মসজিদ একই সাথে শিক্ষা ও ইবাদতের জন্য ব্যবহৃত হতো। অনেক কমপ্লেক্সে গোরস্থানও ছিল, সেখানে প্রতিষ্ঠাতা ও তার আত্মীয়স্বজনদের দাফন করা হতো (Hillenbrand 1986, 1,139)। পশ্চিমের খ্রিষ্টবাদের সেইন্টহুডের মতো কোনো কোনো দরগা পুণ্যার্থীদের দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়েছিল (Brown 1981)। (কেউ কেউ) এই বিশ্বাসেও সেখানে যেতেন যে মৃত ব্যক্তি আল্লাহর সাথে তার সম্পর্কের কারণে হয়তো বিশেষ আশীর্বাদ বা বরকত বয়ে নিয়ে আসবে (Taylor 1999, 127–67)। বর্তমান যুগে বিশুদ্ধবাদী মুসলিমরা এই জাতীয় শ্রদ্ধা নিবেদন নিষেধ করে থাকে। তাদের মাদরাসাগুলো অনুরূপ দরগা পুরোপুরি পরিহার করে থাকে (Metcalf 1982, 157)।

তেরো শতকের শেষভাগে ইরানের ঘটনাপ্রবাহ মাদরাসা ব্যবস্থার উত্থানে নতুন ধারার সূচনা করে। সাইয়েদ আমির আরজুমান্দের (১৯৯৯) ভাষায় 'দাতব্য শিক্ষায়তন কমপ্লেক্স'। যা কারও একক অনুদানে নির্মিত হতো। এতে শুধু মসজিদ, মাদরাসা, নির্মাতার বাসভবনই থাকত না; বরং সাথে হাসপাতাল, খানকাহ, গণশৌচাগার এবং মহাকাশ পর্যবেক্ষণকেন্দ্রও থাকত (Arjomand 1999, 272)! দাতব্য শিক্ষাকেন্দ্র ইরান থেকে খুব দ্রুত মামলুকদের সিরিয়া এবং মিশরে ছড়িয়ে পড়ে। নিকট প্রাচ্যের সীমান্ত অঞ্চলে পূর্ণাঙ্গ কমপ্লেক্স গড়ে উঠতে শুরু করে যেখানে বিশেষ ধারার জনসেবামূলক কার্যক্রম, জাগতিক শিক্ষা এবং মাদরাসা শিক্ষার সমন্বয় ঘটে। তবে নিকট প্রাচ্য এবং উত্তর ভারতে মাদরাসা শিক্ষায় গণিত ও দর্শনের মতো বিষয়গুলো থাকবে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক ছিল। এই বিতর্কের প্রতিফলন ঘটেছে প্রতিদ্বন্দ্বী মাদরাসাব্যবস্থাগুলোর শিক্ষা কারিকুলামে (Robinson 2001, 14)।

[৩] **নোট :** এই বইয়ের অধ্যায়গুলো পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে আজকের বিশ্বেও ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থায় নারীদের অত্যন্ত সরব উপস্থিতি ছিল এবং আছে।

অর্থায়ন ও পরিচালনা

সাধারণত মাদরাসাগুলোতে শিক্ষাভাতা দিতে হতো না। কার্যক্রম সচল রাখতে যে অর্থের প্রয়োজন ছিল তার জোগান আসত শিক্ষার্থীভিন্ন অন্য মাধ্যম থেকে। বেশিরভাগ আসত স্থানীয় অভিজাতদের ধর্মীয় অনুদান থেকে। এই অনুদানের (ইসলামি) আইনি ভিত্তি হচ্ছে ওয়াকফ (বহুবচনে আওকাফ)। ওয়াকফ হচ্ছে সাধারণত ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কোনো জনসেবা বা জনকল্যাণমূলক কাজে অর্থায়নের জন্য প্রদত্ত ব্যক্তিগত ও স্থায়ী অনুদান। মধ্যযুগে যারা মাদরাসার জন্য ওয়াকফ করেছেন তাদের মাঝে রয়েছে শাসক, গভর্নর, ব্যবসায়ী, সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তা এবং বেসামরিক এলিটরা।

বর্তমান সময়ের ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সহজ পর্যালোচনার স্বার্থে এই তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ যে মধ্যযুগেও (বর্তমানের মতো) মাদরাসায় রাষ্ট্রীয় অর্থায়নের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ছিল। রাষ্ট্র মাদরাসা পরিচালনার আইনি নিরাপত্তা প্রদান করত। কিন্তু অর্থায়ন-প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় অনুদানের ভিন্নতা রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যকার বৃহত্তর ক্ষমতার ভারসাম্যের দিকটি প্রতিফলিত করে।

উত্তর-পূর্ব ইরানে দশম ও একাদশ শতাব্দীতে সিভিল সোসাইটি ছিল বেশ শক্তিশালী। মাদরাসার অর্থায়ন ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিল ভূস্বামী ও অন্যান্য অভিজাতরা। "শাসকদের সাথে কুলীন সভ্য সমাজের শক্তিমত্তা ও ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশের একটি পন্থা ছিল মাদরাসার অর্থায়নে শাসকগোষ্ঠীর সাথে প্রতিযোগিতা করা, ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও" (Arjomand 1999, 268)। পক্ষান্তরে সেলজুক শাসনামলে ইরাকে; মামলুক শাসনাধীন মিশর এবং সিরিয়ায় মাদরাসা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করত শাসকরা (Berkey 1992; Chamberlain 1994)। এই দেশগুলোতে বিচারকরা প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাগুলোর প্রফেসরের আসন অলংকৃত করত।

নিকট প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে মাদরাসায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ তথাকার বৃহত্তর আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের প্রতিফলন। মামলুক শাসিত মিশর ও সিরিয়ায় শাসকশ্রেণি ছিল তুর্কি ব্যাকগ্রাউন্ডের, পক্ষান্তরে তাদের প্রজাদের সিংহভাগ ছিল আরব। ফলে তুর্কি শাসকরা জনগণের চোখে তাদের শাসনের বৈধতা উদ্‌পাদনের একটি মাধ্যম হিসেবেও মাদরাসাগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কারণ জনগণ প্রায়শই বিদেশি শাসকদেরকে সন্দেহের চোখে দেখত। অনুরূপ, বিদেশি শাসকরা স্থানীয় অভিজাত পরিবারগুলোকেও বিভক্ত করে রাখত, অন্যথায় তারা শাসক পরিবারের জন্য বহুমুখী 'উৎপাত' বয়ে আনত (Berkey 1992, 45, 116–8; Chamberlain 1994, 91–107)।

নৃতাত্ত্বিক গ্রেগরি স্টারেট সমকালীন মিশরের ইসলামি শিক্ষার ওপর তার রচিত বইয়ে 'ফাংশনালাইজেশন' পরিভাষাটি উদ্ভাবন করেছে। যখন ইসলামি ঐতিহ্যের কোনো উপাদান, যেমন মাদরাসাব্যবস্থা, তার নিজস্ব ইতিহাস ও ডিসকোর্সের মাধ্যমে অন্য কোনো ডিসকোর্সের কৌশলগত (স্ট্রাটেজিক) বা উপযৌগিক (ইউটিলিটারিয়ান) উদ্দেশ্য পূরণ করে, তখন তাকে বলা হয় ফাংশনালাইজেশন (Starrett 1998, 9)। স্টারেট তার ফাংশনালাইজেশন তত্ত্বকে বর্তমান মিশরের শিক্ষাব্যবস্থার আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন।

যেখানে স্টেট-স্পনসরড ধর্মীয় শিক্ষানীতি 'সংক্ষিপ্ত এবং সুনিয়ন্ত্রিত ইসলাম' প্রচার করে থাকে (ibid.), যা সরকারের স্বার্থ রক্ষা করে থাকে (এখানে মাদরাসার মাধ্যমে শাসকদের স্বার্থরক্ষার কাজ আদায় করা হচ্ছে, এটিই ফাংশনালাইজেশন)। এমনকি ক্ষেত্রেবিশেষে তা ধর্মীয় স্কলারদের দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী। ফলে এখানে সিরিয়া ও মিশরের ঐতিহাসিক উদাহরণ প্রাসঙ্গিক। এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে ইসলামি শিক্ষার 'ফাংশনালাইজেশন' নতুন কিছু নয়। বরং সূচনালগ্ন থেকেই মাদরাসার পরিচালনা সেই সমাজের রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রতিফলক।

রাজা, উজির এবং বেসামরিক এলিটরা তাদের আভিজাত্যের প্রকাশ হিসেবে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতেন। এবং সাথে এটিও নিশ্চিত করতেন যে স্কলারদের থেকে যে বার্তা আসছে তা যেন 'বন্ধুসুলভ' থাকে। তবে মধ্যযুগের শাসকরা শুধু সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই মাদরাসার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, বিষয়টা এমন নয়। প্রখ্যাত সেলজুক উজির নিজামুল মুলক নবোত্থিত শিয়াইজমের প্রতিরোধে সুন্নি মতাদর্শকে শক্তিশালী করতে তার মাদরাসা শিক্ষার ধারাকে সুসংহত করেছিলেন।

কখনো কোনো কোনো ভূখণ্ডে বিচারিক কর্মকর্তারা এক মতবাদের মোকাবিলায় অন্য মতবাদ প্রচারের স্বার্থে মাদরাসার পৃষ্ঠপোষকতাকে ব্যবহার করতেন। অনুরূপ, নতুন বিজিত সীমান্ত অঞ্চলসমূহে নবদীক্ষিত স্বল্পশিক্ষিত মুসলিমদের মাঝে ধর্মের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান বিতরণের জন্যও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হতো (Brenner 2001; Grandin 1997; Dhofier 1999)।

উনিশ ও বিশ শতকে ইরানের কাজার শাসক (Menashri 1992, 29; Ringer 2001, 245) এবং উসমানি সালতানাতের শাসকরা (Fortna 2000, 85) সম্পূর্ণ নতুন ও আধুনিক লক্ষ্যে ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থাকে ফাংশনালাইজ করার চেষ্টা করেছেন—জাতিগঠনে সার্বজনীন একক সংস্কৃতি গড়ে তোলা। কিছু শাসক সরাসরি মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেছেন। বাকিরা আলেমদের রোষাণলের ভয়ে তাদের সাথে দ্বন্দ্বে না গিয়ে সমাজে তাদের প্রভাব খর্ব করার উদ্দেশ্যে বরং নিজেদের অর্থায়নে পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলোকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

পন্থা যা-ই হোক, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা শিক্ষাক্ষেত্রে আলেমদের একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়েছে। তখনো পর্যন্ত মুসলিম রাজনীতির প্রাণভোমরা ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র ও কর্তৃত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছে।

মুসলিম ইউনিভার্সিটি?

এক প্রজন্ম আগেও ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাসবেত্তারা মাদরাসার ক্লাসরুম, ডিগ্রি (ইজাযাহ), অধ্যাপনা ও অনুদানের নিরিখে এই উপসংহারে পৌঁছেছেন যে—মাদরাসাগুলো মধ্যযুগের পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমতুল্য (Makdisi 1981)। এক বিবেচনায় এই তুলনা যথাযথ। কারণ একেশ্বরবাদী শিক্ষা মুসলিম ও পশ্চিম—উভয় সভ্যতার গণসংস্কৃতির কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। যা প্রাচীন বিশ্বসভ্যতাগুলোর ক্ষেত্রে ঘটেনি।

কিন্তু আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে মাদরাসাগুলোর তুলনা যথাযথ নয়। কারণ মাদরাসার ক্লাসরুম আর অধ্যাপনার চরিত্র যা-ই হোক না কেন, মধ্যযুগের মাদরাসাগুলোর পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মতো কর্পোরেট আইডেন্টিটি বা কেন্দ্রীয়ভাবে সুসংহত প্রশাসন ছিল না। এসময়ের মাদরাসাগুলোতে পরীক্ষাব্যবস্থা, আনুষ্ঠানিক কারিকুলাম, ডিগ্রি বা কলেজ প্রশাসন ছিল না। বরং আধুনিক যুগ পর্যন্ত মুসলিম-সমাজে ধর্মীয় জ্ঞানান্বেষণ ছিল মূলত ব্যক্তিগত উদ্যোগ। কিংবা আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে জালবদ্ধ (সামাজিক নেটওয়ার্ক) উদ্যোগ। যেখানে শিক্ষার্থীরা নিজেদের দিকনির্দেশনার জন্য প্রাজ্ঞ স্কলারদের শরণাপন্ন হতো।

কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো শিক্ষকের অধ্যাপনার দায়িত্ব, তার সামগ্রিক জ্ঞানবিস্তারে সামান্যই ভূমিকা রাখত। বরং অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ারজুড়ে একজন শিক্ষার্থী একাধিক শিক্ষক এবং একাধিক মাদরাসা থেকে জ্ঞানার্জন করত। এবং তার পরবর্তী পেশাদারত্ব প্রাপ্ত ডিগ্রির পরিবর্তে তার উস্তাদদের খ্যাতি এবং সনদ বা সিলসিলার ওপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে পশ্চিমা 'পরীক্ষাগ্রহণ ও সনদপ্রদান' পদ্ধতির ইউনিভার্সিটির সাথে তুলনা করলে মুসলিম বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল 'গুরুতর' ইনফরমাল বা অপ্রাতিষ্ঠানিক (Berkey 2003, and below)।

হ্যাঁ, ইজাযাহ অবশ্যই প্রচলিত ছিল। কিন্তু তা শিক্ষার্থীর অংশগৃহীত কোনো কোর্সের সার্টিফিকেট বা কোনো পণ্ডিতমহলের সদস্যপদের স্বীকৃতি ছিল না। এটি ছিল শুধু এ কথার প্রমাণ যে এই শিষ্য অমুক শাইখের সাথে 'সম্পর্ক' রাখে (Chamberlain 1994, 89)। ফলে কোথায় পড়াশোনা করবে তা কলেজের খ্যাতির পরিবর্তে সেটি কোন শাইখের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এবং শিক্ষার্থী কার অধীনে জ্ঞানার্জন করতে ইচ্ছুক, তার ওপর নির্ভরশীল ছিল।

মরক্কোর একজন প্রবীণ স্কলার ১৯৬০ এর দশকের শেষদিকে নৃতাত্ত্বিক ডেল আইগেলম্যানকে বলেছিলেন—শিক্ষার্থীরা সাধারণত সেসব শাইখের নিকট যেতে চায় যাদের জ্ঞানের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ রয়েছে (যাদের ইলমে লাদুন্নি রয়েছে), যাদের তাকওয়া বেশি, প্রবীণ, প্রভাবশালী এবং চলতি পথে হাতে প্রাপ্ত চুমুর সংখ্যা বেশি (Eickelman 1985, 105)। শিক্ষকের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কারণ তিনি তার সনদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সময়ের বাধা অতিক্রম করিয়ে ওহির সোনালি রজ্জুর সাথে বেঁধে দেন। আধুনিক যুগের উত্থানে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার অপ্রাতিষ্ঠানিক ও সনদভিত্তিক চরিত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে।

ইসলামের পুনকেন্দ্রায়ন

যদিও মাদরাসা মধ্যযুগীয় ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটির চেয়ে ভিন্ন ধাঁচের ছিল। কিন্তু মধ্যযুগে মুসলিম বিশ্বে মাদরাসার প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ 'বিশ্বনির্মাণে' মহা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পূর্ববর্তী প্রজন্মের ইতিহাসবিদদের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে সুন্নি অধ্যুষিত নিকট প্রাচ্যে মাদরাসাব্যবস্থার উত্থান এবং এই অঞ্চলে শিয়ারাষ্ট্রের রাজনৈতিক উত্থান একই সময়ে ঘটছিল। মুসলিম সভ্যতার প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ মার্শাল হডসনের মতে

মাদরাসাশিক্ষার প্রসার সুন্নি নবজাগরণের (রেনেসাঁ) একটা অংশ ছিল। যার উদ্দেশ্য ছিল শিয়াদের অগ্রাভিযান রোধ (১৯৭৪, ২:৪৫–৪৯)।

তার ভাষ্যমতে এসময় সুন্নি মাদরাসাগুলো রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োগের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষিত ব্যক্তি তৈরিতে মনোনিবেশ করেছিল। অন্য ইতিহাসবিদরা অবশ্য হডসনের সাথে দ্বিমত করেন। তাদের মতে, মাদরাসা রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের প্রশিক্ষণে সরাসরি যুক্ত ছিল—এই দাবি করার মতো পর্যাপ্ত তথ্য নেই (Makdisi 1981; cf. Chamberlain 1994, 70)।

প্রদত্ত প্রশিক্ষণের স্বরূপ যা-ই হোক না কেন, এটি প্রশ্নাতীত যে মধ্যযুগে মুসলিম বিশ্বে মাদরাসাব্যবস্থার উত্থান ধর্মীয় জ্ঞান ও কর্তৃত্বের গতিপথ নির্ধারণে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখেছিল। বর্তমান মুসলিম-শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে এই ঘটনাগুলো শিক্ষাপ্রদ। বার্কে (১৯৯২), চেম্বারলেইন (১৯৯৪) এবং বুলিয়েট (১৯৯৪) দেখিয়েছেন যে মাদরাসার প্রসার ইসলামি শিক্ষা ও কর্তৃপক্ষের (অথরিটি) পুনঃকেন্দ্রীকরণ ও সমরূপীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল (Berkey 2003, 189)।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের ঢেউ অনুভূত হচ্ছিল। প্রথমত, ফিকহ হয়ে উঠে আলেমদের শিক্ষাদীক্ষা ও ধর্মবিজ্ঞানের মধ্যমণি। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ শিক্ষাদীক্ষা যদিও শায়েখদের আসরভিত্তিক ছিল, কিন্তু তরুণ স্কলারদের মধ্যে লিখিত কিতাবাদি ক্রমান্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে শুরু করে। তবে লিখিত কিতাবাদির ওপর গুরুত্বারোপের ফলে কোরআনুল কারিমের শিক্ষা এবং চিরায়ত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মৌখিক ও কথ্য রূপের প্রয়োজনীয়তা মোটেই হ্রাস পায়নি। আজকের দিনেও এটিই ট্রাডিশনাল ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য (Bowen 1993; Messick 1993)। লিখিত কিতাবাদির গুরুত্ব অন্যত্র প্রতিভাত হয়েছে—ধর্মীয় জ্ঞানের সংজ্ঞা ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে। এতদিন যা ছিল শুধু উস্তাদের সিলসিলাভিত্তিক, এখন বৈধ ধর্মীয় স্কলার নির্ধারণের ক্ষেত্রে একই সাথে প্রখ্যাত উস্তাদের সিলসিলা এবং লিখিত কিতাবাদিতে দক্ষতা সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। ভিন্ন ভাষায়—আলেমসমাজে কারও মর্যাদার পরিমাপ হয় লিখিত কিতাবে দক্ষতা, যা কোনো স্বীকৃত উস্তাদের নিকট পঠিত, এবং সেই কিতাব বিষয়ে লিখিত ও মৌখিক পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে। যদিও আলেম-পরিচিতি এবং জ্ঞানের মানদণ্ড নির্ধারণের এই ধারা তৈরির ক্ষেত্রে মাদরাসা এককভাবে কৃতিত্বের দাবিদার নয়। তবে এই পরিবর্তনে মাদরাসা প্রভাবশালী ভূমিকা রেখেছে।

জ্ঞান ও কর্তৃত্বের এই বিবর্তন আজকের ইসলামি শিক্ষায় চলমান পরিবর্তনগুলো বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিশা দান করে। বিশেষত, অর্থোডক্স (সনাতন) ধর্মীয় জীবনযাপন প্রশ্নে। তালাল আসাদের ভাষ্যমতে—'অর্থোডক্সি নিছক কিছু মতামতের সমষ্টি নয়। বরং অর্থোডক্সি হচ্ছে একটি বিশেষ সম্পর্ক। ক্ষমতার সম্পর্ক—সঠিক রীতিনীতি নিয়ন্ত্রণ, প্রচার, বা সংশোধনের ক্ষমতা এবং ভুল রীতিসমূহের সমালোচনা, খারিজকরণ, রহিতকরণ কিংবা প্রতিস্থাপনের ক্ষমতা (Asad 1986, 14)।' এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মাদরাসাব্যবস্থার প্রসার মূলত ক্রমবর্ধমান অর্থোডক্সির অংশবিশেষ, যা ইসলামি ঐতিহ্যের পুনঃকেন্দ্রীকরণে ব্যাপক প্রভাব রেখেছিল।